



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 505 - 510

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

চৈতন্যচর্চার আলোকে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘কান্তাপ্রেম’

অন্নপূর্ণা মাহাত

হিজলি কো অপারেটিব সোসাইটি

খড়াপুর, পশ্চিম মেদনিপুর

Email ID: Annapurnamahato073@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Sri Chaitanya
Mahaprabhu,
Kantaprem,
Humanistic
Love (Manab
Prem), Pancha
Rasa, Bhakti
Movement,
Spiritual
Transformation,
Universal
Brotherhood.

Abstract

This paper explores the biographical and philosophical nuances of Gajendrakumar Mitra's novel 'Kantaprem' (1984), which reimagines the life and spiritual evolution of Sri Chaitanya Mahaprabhu within a modern literary framework. Born in 1486 in Nabadwip during a period of stifling social hierarchy and religious orthodoxy, Nimai (Chaitanya) revolutionized Bengali society by replacing ritualistic dogma with the universal language of Prema (Divine Love).

The novel centers on the protagonist Vishweswar (a literary reflection of Chaitanya), depicting his transition from a proud scholar of logic and grammar to a seeker consumed by the search for God. Mitra skillfully portrays Vishweswar's internal conflict: despite his deep knowledge of scriptures, he feels a void that ritual cannot fill. The narrative highlights the limitations of the Shanta Rasa (awe-inspired devotion), suggesting that intellectual distance prevents true union with the Divine.

The crux of the novel lies in the interaction between Vishweswar and Shyamsundar, a young boy whose selfless, instinctive service transcends scriptural laws. Through Shyamsundar, the author introduces a form of Manab Prem (humanistic love) that challenges the rigidity of asceticism. Shyamsundar's rejection of formal initiation in favor of direct, emotional care serves as a catalyst for Vishweswar's ultimate realization: God is not found in the isolation of the forest or the ink of manuscripts, but in the heartbeat of humanity.

Mitra's 'Kantaprem' elevates the Pancha Rasa (the five devotional flavors) of Gaudiya Vaishnavism— Shanta, Dasya, Sakhya, Vatsalya, and Madhura— by placing human affection at the summit. The novel concludes that true spirituality lies in 'Jibe Prem' (love for all living beings). By deconstructing the 'Superman' image of Chaitanya, Mitra presents a relatable seeker who learns that God arrives in many forms— as a child, a servant, or a friend and that rejecting human love is equivalent to rejecting the Divine. Ultimately, the work stands as a timeless testament to the power of love as the supreme path to liberation.

Discussion

“ওই মহামানব আসে—

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।”

সেই মহামানবের আগমনের কথায় যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে শচীমায়ের কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। দেশের কথা ভেবে, দেশের কথা ভেবে নিজের চাওয়া পাওয়া ভালো লাগাকে বিসর্জন দিয়েছেন। যিনি খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের প্রাণের গোরাচাঁদ। তিনি আমাদের শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে প্রেমের সুতো দিয়ে একটি মালাতে গাঁথতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই যুগ পুরুষকে নিয়ে মানুষের আবেগের খামতি কোথাও ধরা পড়েনি। চৈতন্যদেবকে নিয়ে মানুষের আবেদন চিরকালীন। ছিল। থাকবে। আধুনিক যুগেও তার অন্যথা হয়নি। মানুষ ভক্তির চোখ দিয়ে যেমন দেখার চেষ্টা করেছেন, সেরকমই বিচার বিশ্লেষণ করেও দেখেছেন। তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘কান্তাপ্রেম’ (প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৯০) উপন্যাসটি একটি অনন্য সৃষ্টি।

চতুর্দশ পঞ্চদশ থেকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তৎকালীন সমাজে মুসলমান শাসক শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল প্রবল। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ তথা হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর। তৎকালীন সমাজে হিন্দুধর্মের আচার-আচরণে সাধারণ মানুষ ও নিচু জাতের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ধর্ম তখন বাহ্যিক আচার-আচরণ সর্বস্ব ছিল এবং নিম্ন বর্ণের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এ সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন চৈতন্যদেব। চন্দ্রগ্রহণের সন্ধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করেন নিমাই। অনেকগুলি সন্তান মারা যাওয়ার পর শচী দেবীর কোল আলো করে গৌরানন্দের জন্ম হয়। প্রতিবেশীরা তাঁর গৌর কান্তি রূপ দেখে নাম দেন গৌরানন্দ। আবার নিম গাছের নিচে জন্ম হয়েছে বলে নিমাই নাম রাখা হয়। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত চপল স্বভাবের ছিলেন। বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ তার প্রামাণ্য দলিল। শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রায় সহপাঠীদের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গঙ্গাদাস পন্ডিতের টোলে তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিখ্যাত দিকবিজয় পন্ডিত কেশব কাশ্মীরিকে তর্কে পরাস্ত করেন। তিনি খুব অল্প বয়সে টোল স্থাপন করে এবং পন্ডিত মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বৈবাহিক জীবনে প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী সাপের কামড়ে মারা যান। তখন চৈতন্যদেব বিষুণ্ণীয়া দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে পিতার পিণ্ড দানের জন্য তিনি গয়া গমন করেন। গয়াতে গিয়ে ঈশ্বরপুরের সান্নিধ্য পেয়ে জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। গয়া থেকে ফিরে এসে পাণ্ডিত্যের অহংকার ত্যাগ করে তিনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল হয়ে পড়েন। তৎকালীন সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করতে তিনি আচার সর্বস্ব পূজা আচরণবিধিকে নস্যাৎ করে দিয়ে হরিনাম প্রচার করেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন ‘চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, হরি ভক্তি পরায়ণঃ’। অর্থাৎ হরি ভক্তি থাকলে ব্রাহ্মণের চেয়েও চন্ডাল শ্রেষ্ঠ। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নগর সংকীর্তনের শুরু করেন। উচ্চ-নীচ জাতি হিন্দু মুসলমান অচিরেই নগর সংকীর্তনে যোগদান করে। যবন হরিদাস তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। চৈতন্যদেব মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মায়ের আদেশে পুরীতে থাকা সিদ্ধান্ত নেন। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণভারত, বৃন্দাবন, বারানসি ভ্রমণ করেন। ভক্তি ধর্মের প্রচার করেন। পুরীতে তিনি আঠারো বছর অতিবাহিত করেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে। এই মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ নিয়ে নানা অলৌকিক লৌকিক কাহিনী প্রচলিত। তাঁর মৃত্যুর রহস্য জানা যায়নি। বর্তমানে নানা গবেষণার কাজ চলছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন সুরাহা মেলেনি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যে মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চরসের কথা পাওয়া যায়। এই পঞ্চরস হল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। শান্তরস ভক্তির প্রথম পর্যায়ের। এখানে কৃষ্ণকে ঐশ্বর্যময় রূপে কল্পনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে পরম আত্মরূপে সাধনা করা হয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য জ্ঞান থাকায় ভক্ত ভগবানের প্রতি প্রীতি আন্তরিকতা কমে যায়। শান্ত রসে ভক্ত ভগবানের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ের ভক্তের মনে ভয় ও সন্ত্রস্ত মিশ্রিত ভক্তি স্থান পায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শান্ত রস ততটা প্রাধান্য পায়নি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কান্তাপ্রেম' উপন্যাসে তিনি এই রসের থেকেও যেন মানব প্রেমের রসকে উর্ধ্বে স্থান দিতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকেই বিশ্বেশ্বর চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, বিশ্বেশ্বর প্রথম থেকেই প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধান পেতে চেয়েছেন। তিনি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চান কিন্তু কিভাবে পাবেন তারই অনুসন্ধান মনের মধ্যে সতত চলতে থাকে। 'কান্তাপ্রেম' উপন্যাসে দেখা যায় বিশ্বেশ্বর প্রত্যহ গৃহদেবতা জানকী নাথের পূজা অর্চনা করেন। তৎসঙ্গেও মনের মধ্যে কোথাও যেন এক জিজ্ঞাসা তাড়ণ করে। তিনি নিখাদ ভালোবাসার আকারে ভগবান তো পেতে চান। তাঁর প্রশ্ন -

“সেই তাঁর লক্ষ্য। আচারে নয়, আচরণে নয়, অনুষ্ঠান কি শাস্ত্রের কচকচি তে নয়- তর্ক বিতর্কে ঈশ্বর বহুদূরে চলে যান। লক্ষ্যে পৌঁছাবেন তিনি ভালোবাসার পথেই।”^১

তাঁর স্ত্রী মাধবীর কাছেও জানতে চেয়েছেন। সহসাই বিশ্বেশ্বর দুহাতে স্ত্রীর দুটি হাত ধরে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করে, কতকটা যেন উদভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করেন, -

“মাধবী তুমি কখনো ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেছ করো?”^২

প্রশ্নের উত্তরে মাধবী বলেন তিনি তার স্বামীকেই প্রত্যহ চিন্তা করেন। স্বামীর জন্যই তার একান্ত ভালবাসা প্রেম। তার স্বামীর চিন্তাতেই কাটে সারাদিন। তিনি বলেন আপনি যে আমার ঈশ্বর তাই ভাবনা চিন্তায় কোন অসুবিধা ঘটে না। এই কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে ভেবেছেন। তাঁর মা আর স্ত্রী যদি এত সহজে ঈশ্বর লাভ করতে পারেন তাহলে তিনি কেন পারবেন না। ঈশ্বর লাভ তার কাছেই এত কঠিন কেনো। উপন্যাসের দেখা যায় রঘুবীর পণ্ডিতের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের কথোপকথন। ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ের গ্রন্থ রচনা করেও বিশ্বেশ্বরের মন স্থির নেই। সে সত্যের অনুসন্ধান করতে চাই-

“তিনি আমার মধ্যেই অবস্থান করছেন শাস্ত্র কাররা বলেন। তিনি জীবাত্মা তিনি পরমাত্মা। কিন্তু এছাড়াও কি তার অস্তিত্ব নেই? কেউ কেউ বলেন তাও আছে। সে ক্ষেত্রে কিভাবে কেমন ক'রে তাকে পাওয়া যাবে, তাকে পেয়েছি কিনা তাই কেমন ক'রে বুঝব! যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন বিশ্বেশ্বর।”^৩

ঔপন্যাসিক রঘুবীর চরিত্রের মাধ্যমে দিয়ে কোথাও না কোথাও সখ্য প্রেমের আভাস দিয়েছেন এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। চক্ষু প্রেম হল ভক্ত ভগবানের সমকক্ষ। এরপর দেখা যায় আচার্যের গৃহে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। তার নাম পরমেশ্বর পুরী। পরমেশ্বর পুরী বিশ্বেশ্বরকে প্রথম দেখেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, বিশ্বেশ্বর এর সাথে তাঁর সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তরের। পরমেশ্বর পুরী বিশ্বেশ্বরকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে মূর্ছা যান। আচার্য কিছুটা ভিড় সরিয়ে বিশ্বেশ্বরকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এলেন এবং আগত সন্ন্যাসীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এই সন্ন্যাসী পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পরমেশ্বর পুরী সর্বজন পূজ্য শ্রীমৎ শ্রী কৃষ্ণেন্দুপুরীর প্রধান শিষ্য। বিশ্বেশ্বরের সুগঠিত দীর্ঘ দিব্য দেহ, অনিন্দ্য সুন্দর গঠন দেখে ঈশ্বরপুরী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ইনি বোধ হয় কোন ঈশ্বরের অবতার। বিশ্বেশ্বরের মনে যা আলোড়ন চলছিল সন্ন্যাসের কাছে তিনি অকপটে আত্মনিবেদন করলেন। সন্ন্যাসী ও ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছিলেন যে, তার জন্ম গ্রহণ করা বৈরাগ্য সাধনা, সন্ন্যাসের বাসনা, সবই লীলাময়ের খেলা। এই ছেলেটিকে দীক্ষা দানের জন্য তার জন্ম সার্থক।

“প্রভু, নানা দেশ ঘুরে দেখলাম, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, এত কাল বর্ধিত হয়েছে, সেখানকার মানুষ তো দেখছিই - সাধারণ মানুষের বড় দুঃখ। তারা জ্ঞান শিক্ষা তপস্যার কথা কিছু জানে না, বোঝে না, আহমিকা- সার পণ্ডিতদের উপদেশ নির্দেশের দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় না। বরং বহু ভ্রষ্টাচারী সাধক গুরুনামধারী- তাদের কদর্য সাধনপদ্ধতিতে ঐ সব অবোধ মানুষদের বিপথে নিয়ে গিয়ে অধিকতর দুঃখের কারণ হচ্ছে। আমি চাই সহজ সরল সাধনার মধ্য দিয়ে অন্তরের প্রেম ভক্তির মধ্য দিয়ে ভগবদ প্রেমমাধুর্যের সাধ পাক তারা, দেহজ দুঃখ সংসারের নানা কষ্ট দুঃখ নিপীড়ন থেকে উত্তরিত হয়ে এক পরম আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছাক। আমিও ওই ভাবেই তাঁকে চায়। আপনি সেই পথই আমাকে দেখান।”^৪

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে পরমেশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের কথা জানান। কিন্তু পরমেশ্বর পুরী জানান দ্রুত এ কাজ করতে নেই আগে দেবতার কথা জানো, ভাবো, চিন্তা করো, তারপর বিচার বিবেচনা করে দীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবা হবে। এই বলে তিনি প্রস্থান করেন।

বিশ্বেশ্বর সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর প্রতিনিয়তই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি কখনো পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসীদের জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা তাদের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পেয়েছেন কিনা? এই উপন্যাসে বিশ্বেশ্বর পুরীতে থাকাকালীন দেখা যায় সেবক বিষ্ণুদাস তার সেবার কাছে যুক্ত ছিল। উপন্যাসে আরেকটি চরিত্র দেখা তার নাম শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের দশ-বারো বছর বয়সী ব্রাহ্মণ বালক দেখতে শ্যাম উজ্জ্বল। তার মা বিধবা। তাদের আত্মীয় পরিজন কেউ নেই, কিছু নেই। মা মন্দিরে দেবগৃহের নিত্যপূজা ভোগের বাসন মার্জনা করে কোন মতে দুটি প্রাণীর জীবিকা নির্বাহ করে। মায়ের নাম মালতি। শ্যামসুন্দর অত্যন্ত মেধাবী তার মা তাকে একটি চতুপাশীতে ভর্তি করেন। কিন্তু শ্যামসুন্দর সেখানে থাকতে চাইনি। সে মুখের উপর বলে দেয় যে—

“এসব বৃথা শাস্ত্রের কচ কচি, কতগুলো শব্দ-বাক্য আমার ভালো লাগেনা। যে আমাকে ভালোবেসে ভালোবাসার পথে আসল যা শিক্ষা দেবে, সে-ই আমার যথার্থ গুরু, আমি তাকেই খুঁজছি।”^৫

বিশ্বেশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয়েছিল কৃষ্ণপ্রাণ। এদিকে শ্যামসুন্দর নিজের মাকে ছেড়ে কৃষ্ণপ্রাণের কাছে চলে আসে। কৃষ্ণপ্রাণকে অবলীলায় আগলে আগলে রাখতে চায়। সেবক বিষ্ণুদাস যখন কৃষ্ণপ্রাণকে প্রসাদ দেয় তখন পাশে বসে ছিল শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দর উচ্চস্বরে স্পষ্টভাবে কৃষ্ণপ্রাণকে জানিয়ে দেয় –

“আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকব, যতদিন আমার ইচ্ছা। যদি থাকতে না দাও আমি কিছুই খাব না। না খেয়ে এখানেই দেহপাত করব। এরা যদি জোর ক'রে বাইরে ফেলে দেয়— রাস্তাতেই পড়ে থাকব, সেখানেই মরব। আমি মিথ্যা কথা বলি না, তোমাকে ছুঁয়ে তো বলবোই না। আমার যে কথা সেই কাজ।”^৬

প্রসাদ পাওয়ার পর যখন কৃষ্ণপ্রাণ কুঠরিতে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দরও যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। কৃষ্ণপ্রাণের সেবকরা তাকে যেতে বাধা দিলে সে বাধা মানে নি। সে কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর থেকেই শ্যামসুন্দর কৃষ্ণপ্রাণের সঙ্গে সেই ছোট্ট কুঠিরেই থাকে। দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কৃষ্ণপ্রাণকে ঘুমিয়ে পড়তে আদেশ দেন শ্যামসুন্দর। এই আদেশ নিভূতি না করে কৃষ্ণপ্রাণ তার আদেশ পালন করে। পরে প্রভু যখন বলেন আমার কথা আমি বুঝি, তখন শ্যামসুন্দর জানায় তুমি এত কষ্টে থাকো কেন, না খেয়ে দেয়, শরীর কাঠ করে কি লাভ। এই শরীর দিয়ে ভগবান সেবা করবে কি করে? এই সাধু সাজা লোক দেখানো ভন্ডামি। শরীর নষ্ট হলে সেবা করবে কি দিয়ে। অভিজ্ঞ লোকের মতো শ্যামসুন্দরের মুখে এই কথা শুনে কৃষ্ণপ্রাণ চমকে উঠেন। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে ও অচিরেই চোখ বন্ধ করে থাকাকেই উত্তম বলে মনে করলেন। শ্যামসুন্দর তখন নিরবে মৃদু কমল হস্ত দিয়ে ওর কোমর ও পা দুই হাতের তালু টিপে দিলেন। রাতে অসহ্য গরমে শ্যাম সুন্দর একটি তালপাতার পাখায় কৃষ্ণপ্রাণকে বাতাস করতে আসে কিন্তু কৃষ্ণপ্রাণ জানান সন্ন্যাসীদের আরামে থাকতে নেই। বাতাস করার দরকার নেই। শ্যামসুন্দর এই কথার প্রতিবাদে জানায় সন্ন্যাস নিলেই যে গরমে কষ্ট পেতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। সে আবারও মনে করিয়ে দেয় যে কৃষ্ণ প্রাণ যদি আসলে সবার আম ভাগ করতে চাইছেন। তবে তিনি ঘরে না শুয়ে গাছের তলায় থাকতে পারতেন। কারণ কৃষ্ণপ্রাণ ইতিমধ্যেই অনেক সুযোগ নিয়েছেন। শিষ্যরা তার পা টিপে দেয়, ভক্তরা খাবার বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস হাতের কাছে পৌঁছে দেয়। তাহলে শুধু পাখার বাতাস নিতে অসুবিধা কোথায়? একজন ভক্ত সেবক এর কাছে প্রিয় মানুষের কষ্ট সহ্য হয় না বালকটি তার সরল মন দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে হার মানিয়েছে, কৃষ্ণপ্রাণ ঘুমিয়ে গেলেও সে ঘুমায় না সে শেষ প্রহরে ঘুমায়। শ্যামসুন্দরের এহেন আচরণে অন্যান্য ভক্ত সেবক যথা শিবদাস, বিষ্ণুদাস বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণপ্রাণ বাধা দিয়ে বলেন – ‘পাখা চালাবে তুমি ছেলেমানুষ, তোমার গায়ে ব্যথা হবে না? পরকে কষ্ট দিয়ে আরাম নেওয়া অধর্ম।’ শ্যামসুন্দর বলে, আমি আর বাবু এত বকতে পারি না তোমার সঙ্গে। পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদছে, এই যে গরমে সেদ্ধ হচ্ছে— নিজের শরীরকেই বা কষ্ট দিচ্ছ কেন? শরীরে তোমার ঠাকুর আছেন তোমার শরীর বলে কেটে নে পালিয়ে যাবেন বেশ

তো, আমার যখন কষ্ট হবে তুমি বাতাস কর তাহলেই হবে। বাইরে থেকে ভক্তরা প্রবল তিরস্কার করে ওঠেন প্রভু তোমাকে বাতাস করবেন তোমার সাহস তো কম নয় মুখে আনলে কি ক'রে! একেই বলে মূর্খ অর্বাচীন! তেমনি উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেয় শ্যাম সুন্দর, 'সাহস কোথা থেকে আসে তোমরা কি জানবে। ভালোবাসাই সাহস যোগায়। তোমরা ভক্তি করো— ভালোবাস কি?'^১ নিষ্কাম ভক্তি ও ভালোবাসার অন্যান্য আখ্যান 'কান্তাপ্রেম' উপন্যাসটি। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মানুষের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা অনেক সময় শাস্ত্রীয় নিয়ম বা কঠোর সন্ন্যাসকেও হার মানায়। শ্যামসুন্দর তার নিঃস্বার্থ সেবা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়ে নিরন্তর দিনরাত কৃষ্ণপ্রাণের সেবা করেন। কৃষ্ণপ্রাণ যখন দেখে দীর্ঘ সেবার পর অন্য ভক্তরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও এই বালক নিজের কথা না ভেবে সন্ন্যাসীর সেবা করে যায়। শ্যামসুন্দরের কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ভক্তি বনাম মানব ভালোবাসা প্রকাশ পায়। কৃষ্ণপ্রাণ, শ্যামসুন্দরকে ভগবানের দীক্ষা নেওয়ার জন্য কৃষ্ণপ্রাণ বললেন—

“আয় আমি তোকে দীক্ষা দিই। আনন্দ পাবি। আমায় যেমন ভালোবাসিস তেমনি এই ভালোবাসা তাকে দে, তাকে পাবি।”^২

শ্যামসুন্দর তা অদ্ভুত সরলতায় প্রত্যাখ্যান করে। ‘কই তুমি পাচ্ছ শ্যামসুন্দর বলে,’ তুমিও তো সন্ন্যাসী, জপতপ কিছুই বাদ দাও নি, তাকে ভালোবাসবে বলেই সংসার আত্মীয়জন সব ছেড়েছ— তবে কোথা কৃষ্ণ কোথা প্রাণনাথ বলে কাঁদো কেন?... ওসব কিছু না। এই ভালোবাসা মানুষকে দিলে অনেক পেতে, প্রাণ ভরে যেত।’^৩ এই কথা শুনে কৃষ্ণপ্রাণ সহসা স্বচকিত হয়ে পড়ে তিনি যেন বেতের আঘাত করার মত লাফিয়ে ওঠেন।

শ্যামসুন্দর জানায় পাথরের মূর্তির চেয়ে এ সন্ন্যাসী মানুষটিকে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষটিকে ভালবাসতে তার বেশি ভালো লাগে। এই কথা শুনে উনি আর কোন কথা বলেন না এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ওই ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবেন এতদিনের সাধনা কল্পনা ওর মনের ভাব কি ছেলেটা সব বোঝে। এই ভাবনায় তিনি ভাবতে থাকেন। কৃষ্ণপ্রাণ যুক্তি দেন ভালোবাসা সম্পর্ক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কৃষ্ণপ্রাণ বলেন যে মায়ের প্রতি একরকম স্ত্রীর প্রতি অন্যরকম বন্ধু সখার ভালোবাসা আবার অন্যরকম হয়। শ্যামসুন্দর এই যুক্তিখন্ডন করে বলে যে ‘ওমা, ভালোবাসা আবার এভাবে ওজন ক'রে ভাগ ক'রে রকম রকম ভাবে আছে বুঝি? ভালোবাসলে এ বিচার থাকবে কেন? বিষয় নয় তার কাছে কৃষ্ণপ্রাণ কোন নির্দিষ্ট পরিচয় বাবা-মা গুরুজন নন বরং ভালোবাসার এক পূর্ণরূপ শ্যামসুন্দর জানাই ওমা ভালোবাসা আবার এভাবে ওজন করে ভাগ করে রকম রকম ভাবে আসে বুঝি ভালোবাসলে এ বিচার থাকবে কেন তুমি যে জগন্নাথকে ভালোবাসো ওটা কি মূর্তি বলতো মেয়েরা সে আমার কিছুই তো বোঝা যায় না তবে অমন পাগলের মতো ভালোবাসো কি করে দাঁড়িয়ে থাকো এই যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার স্ত্রীকে স্বামী বাবা কি মায়ের সব কথা তো মনে পড়ে না তুমি পুরুষ কি মেয়ে তাও তো কোনদিন ভাবিনি। তোমার মতো ভাগ ভাগ ক'রে ধরে, ছেলের এইটুকু নাতির এইটুকু— ভালোবাসা যায় নাকি? মনের মধ্যে এরকম ভালোবাসা থাকে? যাকে ভালোবাসবে তাকে সব টুকু দিলে তবে তো তার ভালোবাসা পাবে। ভগবানকেই যদি ধরো, তাকেও সবটুকু না দিলে তিনি সবটুকু দেবেন কেন?’^৪

শ্যামসুন্দরের যুক্তি শুনে সন্ন্যাস কৃষ্ণপ্রাণের জীবনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি রূপান্তর ঘটে, তিনি উপলব্ধি করেন সারা জীবন শাস্ত্র, তপস্যা, আরাধনা, সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে চলেছেন কিন্তু শ্যামসুন্দরের এই নিঃস্বার্থ ও বিচারহীন ভালোবাসা তাকে এক নতুন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। কৃষ্ণপ্রাণ অনুভব করেন যে, বনের নিভূতে বা শাস্ত্রের পাতায় যা মেলেনি তা এই বালকের সরল আলিঙ্গনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। শ্যামসুন্দরের এই গভীর মমতা অপত্য স্নেহ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। বৃন্দাবনের গোপীরা যেমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসে শ্রীকৃষ্ণ কে পেয়েছিলেন সেই রকম ভাবেই তিনিও পেতে চান। অর্থাৎ উপন্যাসের পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায় যে শ্যাম সুন্দরের চলে যাওয়ার পর কৃষ্ণপ্রাণ উপলব্ধি করেছেন এত তপস্যা করেও এত সাধনা করেও তার মন নির্মল হয়নি।

তিনি অনুভব করেছেন নিজের স্বার্থে বাধা হওয়ার জন্য নিত্যরূপানন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার করতে। কৃষ্ণপ্রাণ পরে বুঝতে পারেন যে, তার এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোন শুভবুদ্ধি নয় বরং কাজ করছিল আত্ম-অহমিকা। কারণে নিত্যরূপানন্দের ব্যক্তিত্বে দীপ্ত ছিল। শক্তি ছিল। ক্রমশ তিনি যেন নায়ক মন্ডলের প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নিজের সাধনা নিজের সাধনার জোরে ঈশ্বরকে একা নিজের আয়ত্বে আনবেন এবং সেই

অমৃত একাই আত্মদান করবেন। মানুষকে ভালবাসার মধ্যে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় ভালোবাসা গ্রহণ করেন এবং প্রতিদানও দেন ঈশ্বরের প্রেম মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছায় সেই উপলব্ধি তার আসেনি। কৃষ্ণপ্রাণ অনুশোচনা করেছেন, বুঝতে পারেননি। ঈশ্বরকে অবহেলায় বিদায় দিয়েছেন। ‘আজ মনে হচ্ছে নানা রূপে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রিয়তম, তাঁর প্রভু এসেছেন তাঁর কাছে। সেবক রূপে এসেছেন সেবা করতে, সন্তানের মত এসেছেন স্নেহ আত্মদান করতে। বুঝি এই ভাবেই আসেন। যুগযুগান্তর ধরে, জন্ম জন্মান্তর ধরে আসছেন তিনি নানাভাবে নানা রূপে ভক্তদের কাছে। লীলাময় তিনি- এ সৃষ্টিও তাঁর লীলা, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, প্রেম এইসব বৃত্তি ও তাই। তিনি নিজে সৃষ্টির এই সমস্ত সুখ, এই সমস্ত অমৃতরসস্রাবী বৃত্তি সম্ভোগ করতে চান। কেউ বুঝেছে চিনেছে - কেউ পারে নি। তিনি ম্লান মুখে বিষন্ন চিত্তে ফিরে গেছেন। হয়তো, যেমন আজও ফিরে গেলেন।”

অর্থাৎ উপন্যাসের গভীরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গজেন্দ্রকুমার মিত্র বিংশ শতকে আশীর দশকে এই উপন্যাসটি লিখছেন। উত্তরাধুনিক সমাজে তখন মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঐতিহ্যকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হয়ে চলেছে। উপন্যাসিক সুচারু ভাবে মধ্যযুগের চরিত্রকে বর্তমানে এক নতুন রূপ দান করেছেন। ধর্মীয়ও প্রেক্ষাপটের বাইরে উপন্যাসটি রচনা করেছেন। যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে মানব প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা যায় ঈশ্বরকে পাবার মূল মন্ত্র হচ্ছে জীব প্রেম। কৃষ্ণপ্রাণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা যেন দেখিয়ে দিয়েছেন তার উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কৃষ্ণপ্রাণ যেমন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি প্রেমেই হল আসল ভক্তি। তার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরে লাভ করতে পারে। লাভ করে চলেছে। তিনি যেন বৈষ্ণব পঞ্চরসের উর্ধ্বে মানব প্রেমের রসকে স্থান দিয়েছেন।

Reference:

১. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, মাঘ ১৩৯০, পৃ. ২০
২. ঐ, পৃ. ২৭
৩. ঐ, পৃ. ১২
৪. ঐ, পৃ. ৪২
৫. ঐ, পৃ. ১১৫
৬. ঐ, পৃ. ১২৫
৭. ঐ, পৃ. ১৩০
৮. ঐ, পৃ. ১৩৫
৯. ঐ, পৃ. ১৩৫
১০. ঐ, পৃ. ১৩৫
১১. ঐ, পৃ. ১৪৫

Bibliography:

১. গিরি, সত্যবতী, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্চা, দিয়া পাবলিকেশন প্রথম প্রকাশ ১ মে, ২০১৭
২. খান, লায়েক আলি, প্রসঙ্গ : বৈষ্ণব সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ দোল পূর্ণিমা ১৪০২
৩. মল্লিক দীপঙ্কর ও মল্লিক দেবারতি, চৈতন্য চর্চা, (১ ম খন্ড) সন্ধান বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি সাহিত্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা। প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০২৪
৪. সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারা পদ (সম্পাদ), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ।
৫. মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, মাঘ ১৩৯০